যেখানে প্রত্যেকের সকলে এবং সকলের মধ্যে প্রত্যেক থাকে, যেখানে সত্তার স্তরে স্তরে [illegible]
চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্য, গতির সঙ্গে গতি, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ।

আরোহণ অথবা বিবর্তন (Ascent or Evolution):

শ্রী অরবিন্দ মনে করেন, বিবর্তনের প্রাক অবস্থা 'কুণ্ডলীকরণ' (involution)। বস্তুতঃ বিবর্তন সম্ভব হয় কারণ কুণ্ডলীকরণ ইতিমধ্যেই ঘটেছে। এই দুই পদ্ধতির মধ্যেই যুক্ত আছে সত্তার আটটি স্তর। আধাত্ম শক্তি প্রথমে জড়, প্রাণ এবং মনে অবরোহণ (discent) করেছে তারপর আবার আরোহণ করবে উচ্চ স্তরে। জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, কেননা প্রাণ,

জড়ের মধ্যে সুপ্ত আছে, প্রাণ, মনের স্তরে উন্নীত হয়েছে। কারণ প্রাণের মধ্যে মন সুপ্ত ছিল। শ্রীঅরবিন্দের মতে, শূন্য থেকে বিবর্তন সম্ভব নয়।

শ্রীঅরবিন্দের বর্ণিত 'বিবর্তন' একটি বিশিষ্ট চরিত্রের যার সঙ্গে অন্যান্য চিন্তাবিদদের বিবর্তন ভাবনার কোন মিল নেই। কেউ পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ উন্মেষমূলক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ যান্ত্রিক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ বা আবার উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনের কথা বলেন। পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তন বলে, বিবর্তন হল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কম-বেশি একই আকৃতি ও বিষয়ের পুনঃসংগঠন মাত্র। এ জাতীয় বিবর্তন একই সত্তার পুনরাবৃত্তিমাত্র। এর বিপরীত তত্ত্ব উন্মেষমূলক বিবর্তন। সেখানে বিশ্বাস করা হয়, বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই নতুন কিছু উদ্ভব হয়। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে, পূর্ববর্তী শর্তের ভিত্তিতে আর উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদে বলা হয় বিবর্তনের সব ক্ষেত্রেই একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্ব হল 'অখণ্ড বিবর্তনবাদ' (Intergral Evolution)।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের বৃদ্ধি ঘটে ত্রিবিধ পদ্ধতিতে। এগুলি হল প্রশস্তকরণ (widening), উন্নতিবিধান করা (leightening) এবং অখণ্ড সমন্বয়করণ (integration), এই পদ্ধতিতে কোন কিছুকেই সম্পূর্ণ বাতিল করা হয় না। সব কিছুকেই পরিণামে অখণ্ডভাবে যুক্ত করা হয়। প্রশস্তকরণ পদ্ধতির অর্থ হল নতুন তত্ত্বের জন্য আরো সুযোগ সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি উন্নতিবিধান করার অর্থ এক ধাপ থেকে আর এক উন্নত ধাপে আরোহণ। কিন্তু বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল অখণ্ডতা।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের দুটি ধারা। একটি হল জন্মচক্রের মাধ্যমে বাহ্য শরীরের উন্নতি, অন্যটি অন্তঃস্থ পুরুষের ক্রমবিকাশ। ক্রমবর্ধমন চেতনার জন্য শরীরেরও উপযুক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। একদিকে চেতনার উন্নতি হচ্ছে, অন্যদিকে তার উপযোগী শরীরের বা আধারের সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবেই পরিণামে জড় হয়ে উঠবে পরম চিৎপুরুষের পূর্ণ অভিব্যক্তির যোগ্য বাহন।

তাঁর বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে একাধিক আপত্তি উঠেছে। সেগুলি এই রকম:

১) বলা হয় যে চেতনার সপ্ত পর্যায়। জড়ের মধ্যে চিৎপুরুষের অধিষ্ঠান এবং সেখান থেকে এর পুনরুত্থান, জীবের পুনর্জন্ম প্রভৃতিস্বীকার করলেও, জীবের উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী তার যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। আর সচ্চিদানন্দ সৃষ্টি করেছেন আনন্দের জন্য, লীলার জন্য। নূতন সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁর থাকতে পারে না, কেননা তাঁর কোন অভাব নেই। তাই বিবর্তনের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

২) শ্রীঅরবিন্দ যেমন মনে করেন, সেইরকম জড়ের পরে প্রাণের এবং প্রাণের পরে মনের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মনের পর যে অতিমানসের আবির্ভাব হবেই - তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, এই জন্যই যে, মন অপরার্ধের শক্তি, অথচ অতিমানস পরার্ধের শক্তি। অতিমানস উচ্চস্তরের শক্তি হয়ে কেন এবং কিভাবে নিম্নস্তরে মনের মধ্যে নেমে আসবে?

৩) আধুনিক বিজ্ঞান যদিও বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে, কিন্তু বিজ্ঞানের এই কথাই যে চরম সত্য এমন বলা যায় না, কারণ এমন অনেক বিষয় আছে, যাকে বিজ্ঞান এককালে সত্য বলতো, কিন্তু বর্তমানে তাদের মিথ্যা বলছে।

৪) জগতে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিশীল জীবের স্বধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। মানুষেরও নিজের 'স্ব-ধর্ম' আছে। স্বধর্মের মধ্যে মানুষ উন্নতি করতে পারে। কিন্তু স্বধর্মকে অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে

অসম্ভব। অতিমানব হয়ে দেবত্ব লাভ করা যেহেতু তার স্বভাব বিরুদ্ধ—তাই অসম্ভব।

এই আপত্তিগুলির উত্তর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে দিয়েছেন এভাবে: প্রথম আপত্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্বসৃষ্টির পেছনে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই—কেবল এক অচেতন শক্তির ক্রিয়া এই জগৎ। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, সৃষ্টির প্রতি বিষয়ের মধ্যে এতো জটিল ও সুনিপুণ নিয়ম ও শৃঙ্খলা রয়েছে, যাকে আকস্মিক সমাবেশের ফল বলা যায় না। গূঢ় চিৎপুরুষের সংকল্পের দ্বারাই কেবল এটি সম্ভব হতে পারে। জগৎ সৃষ্টি শুধু লীলা বা আনন্দের জন্য হলেও এই লীলার একটা উদ্দেশ্য আছে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে জগৎ অবিদ্যাময়। সেখানে মনের পর অতিমানসের আবির্ভাব যে হবেই - তার নিশ্চয়তা কি? কারণ উচ্চস্তরের অতিমানস কিভাবে নিম্নস্তরের মধ্যে অবতরণ করবে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন, জগতের উৎপত্তির কারণ অবিদ্যা নয়। সচ্চিদানন্দ নিজেই নিশ্চেতনার মধ্যে নেমেছেন এবং তাঁর দিব্যজ্ঞান সংকুচিত ও আবৃত হওয়াতেই অবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। নিমজ্জিত দিব্যজ্ঞান আবার ক্রমপ্রকাশিত হয়ে পূর্ণজ্ঞানের পথে চলেছে। মানুষের অবিদ্যা হল নিশ্চেতনা ও দিব্যজ্ঞানের মধ্যবর্তী অবস্থা। এটি দিব্যজ্ঞানের সংকুচিত রূপ ঠিকই, কিন্তু মূলতঃ দিব্যজ্ঞান, মানসচেতনার উর্দ্ধে আরও যেসব চেতনার পর্যায় আছে, তাদের শক্তির প্রভাব মানব চেতনায় আসে মানুষও কখনও কখনও অলৌকিকভাবে এদের কথা জানতে পারে। এই সব শক্তি ও অতিমানসও প্রচ্ছন্নভাবে জগতের মধ্যে সক্রিয় থেকে বিবর্তনের ধারা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই প্রাণ ও জড়ে যেমন মনের আবির্ভাব হয়েছে, মনেও সেইরকম অতিমানসের আবির্ভাব শুধু স্বাভাবিক নয়—অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় আপত্তি বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরুদ্ধে, এই বিষয়টিকেও শ্রী অরবিন্দ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞান বাইরের আকার পরিবর্তনের কথাই শুধু বলে, কিন্তু মূল কথা অন্তর্নিহিত চিৎ-শক্তির ক্রম-প্রকাশ। চেতনার জন্যই আকার সৃষ্টি, আকার চেতনার আধারমাত্র। বাইরের দিক থেকে দেখা যায় যে ধীরে ধীরে বিষয়সমূহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং আকার যতই উন্নত, জটিল ও সুগঠিত হচ্ছে, ততই উন্নততর চেতনার আবির্ভাব হচ্ছে। এর কারণ হতে পারে যে দিব্য চিৎ-শক্তি পর পর নূতন আকার ও নূতন চেতনা সৃষ্টি করে চলেছে, কিম্বা পূর্বের বিষয় থেকেই পরের বিষয়ের আকার ও চেতনা গূঢ়ভাবে গঠন করছে, যেমন জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে মন এসেছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আকস্মিকভাবে নয়, বিষয়সমূহের চেতনা ও আকার ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, নিম্ন প্রাণীচেতনা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে যখন উচ্চ প্রাণীচেতনায় উপনীত হয় - তখন এটি অনেক দিক থেকেই মানব চেতনার অনুরূপ। সেই পর্যায় থেকে মানব চেতনা ও তদুপযোগী দেহের আবির্ভাব হয়েছে। এই তথ্যই সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত।

চতুর্থ আপত্তির উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, একথা সত্য যে বিষয়সমূহ আপন আপন জাতির ধর্ম পালন করে মানুষও স্বধর্ম পালন করবে। কিন্তু অন্য সব থেকে মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে সে সর্বদাই চায় নিজের গণ্ডী অতিক্রম করতে —এটাই তার প্রকৃত স্বধর্ম। মানুষের স্বভাব হল নিম্ন থেকে উচ্চে আরোহণের আস্পৃহা। একথা ঠিক যে মানবজাতির অগ্রগতি একটানা হয়নি, সে কখনও ওপরে উঠেছে, কখনও নিচে নেমেছে। কিন্তু মানব তার শক্তিকে আরও তীক্ষ্ণ ও

সাবলীল করে নূতন নূতন বিষয়ে প্রয়োগ করেছে। চিন্তা ও ভাবের উৎকর্ষে সে হয়তো মহান পূর্বসূরীদের সব সময় অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা সে প্রাচীন যুগ অপেক্ষা বর্তমান যুগে রাষ্ট্র, সমাজ, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, জীবনধারা প্রভৃতি বিষয়ে নানা ভাবনার অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তন তত্ত্বে আমরা দেখতে পাই যেমন মহাজাগতিক বিবর্তন তেমনি ব্যক্তির বিবর্তন। বিবর্তন, তাঁর মতে, যেমন জাগতিক, তেমনি ব্যক্তির হবেই। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিই হল আধার, যার মাধ্যমে চিৎশক্তি তার সত্তাকে প্রকাশ করবে। সুতরাং ব্যক্তির আরোহণ কেবল প্রতীকী নয় বরং তা জাগতিক বিবর্তনকে সাহায্য করে, দ্রুত করে। এটাই শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড বিবর্তনের মূলকথা।

মানব প্রকৃতি (Nature of Man):